দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 01 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

চট্টগ্রামে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে বাণিজ্য

মাকসুদ আহমদ, *চট্টগ্রাম অফিস*

চট্টগ্রামে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের নামে বাণিজ্য জমে উঠেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা কমিটি বা মালিক পক্ষ শিক্ষকদের হাঁটাই করার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। ফলে নগরীর বেশকিছু বেসরকারী স্কুল এ্যান্ড কলেজে শিক্ষক নিয়োগের নামে চলছে বাণিজ্য। এক সময় ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হতো। কিন্তু তা এখন কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট ফরমে বা নগদ অর্থের মাধ্যমে চালু হয়েছে। নগরীর বেশ কয়েকটি স্কুল এ্যান্ড কলেজ বার বার দৈনিক পত্রিকায় শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সিস্টেম পরিবর্তন করে হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অঙ্কের অর্থ। চাকরিপ্রার্থীরা একে তো বেকার, অন্যদিকে আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত পে-অর্ডার বা নগদ অর্থ জমা দিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন স্কুলসংখ্যা প্রায় ৯শ'। এর মধ্যে শুধু চট্টগ্রাম শহরেই রয়েছে দেড় শতাধিক। ইতোমধ্যে অনেক স্কুল শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রক্রিয়া ও পরীক্ষার ফল ভাল করায় শিক্ষা অধিদফতর ও শিক্ষা বোর্ডের অনুমতিক্রমে ক্রমান্বয়ে তা কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে শিক্ষার মান উন্নত না করে অনেক কিন্ডারগার্টেন একই হাল ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা অনেক কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষা অধিদফতর ও বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই স্কুল এ্যান্ড কলেজের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে। ফলে একের পর এক নিম্নমানের স্কুলগুলোও স্কুল এন্ড কলেজে রূপ নিচ্ছে। নগরীতে রয়েছে মাত্র ৯টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়। ফলে নগরীতে বেসরকারী স্কুল ব্যতীত সরকারী স্কুল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বেশিরভাগ স্কুলই কলেজের সাইনবোর্ড লাগিয়ে ভেতরে প্রাইমারী স্কুল চালু রেখেছে। অর্থাৎ বাইরে স্কুল এ্যান্ড কলেজ লেখা থাকলেও ভিতরে নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কার্যক্রম চালু রেখেছে। এদিকে, শিক্ষক

বছরে একাধিকবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

নিয়োগে রয়েছে ব্যাপক অনিয়ম। স্কুল কমিটির ছাপানো নির্ধারিত ফরমে এখন চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন করতে হয়। যা পূর্বে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে নেয়া হতো। এ ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যাংক ড্রাফটের বিপরীতে পরিচালনা পর্ষদকে ব্যাংক কোন প্রকার কমিশন দিতে না হলেও ব্যাংকের সঙ্গে এ ধরনের লেনদেন বন্ধ করে দিয়েছে তারা। আরও অভিযোগ পাওয়া গেছে, ব্যাংকের সঙ্গে এ ধরনের লেনদেন করা হলে পরিচালনা পর্ষদের আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে সরকারের অর্থ সংশ্লিষ্ট দফতরগুলো অবগত হয়। এতে করে আয়করের ব্যাপারটি উঠে আসে। ফলে আয়কর ফাঁকি দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট সিস্টেমটি এড়িয়ে কর্তৃপক্ষের বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র গ্রহণের অভিনব সিস্টেম চালু করেছে। অন্যথায় কর্তৃপক্ষের কিছুটা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ফলে কমিটি ব্যক্তিগত উদ্যোগকেই বেছে নিয়েছে। পদ্ধতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে আবেদনপত্র থেকে আদায়কৃত অর্থের শতকরা এক শ' ভাগ পরিচালনা পর্ষদের আয় হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এভাবে ক্রমান্বয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে স্কুল এ্যান্ড কলেজে শিক্ষক নিয়োগের নামে। জমজমাট এ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে অনেকেই। ফলে প্রতি দু' চার মাস অন্তর কিছু অসাধু পরিচালনা পর্ষদ শিক্ষক নিয়োগের নামে বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে দেয় দৈনিক পত্রিকায়। এতে করে বেকার শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীরা সোনার হরিণ ধরতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ণা দিচ্ছে। এছাড়াও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে অতিরিক্ত শূন্য পদ দেখিয়ে আবেদনকারী বাড়ানোর পায়তারাও চালাচ্ছে পরিচালনা পর্ষদ। মূলত এদের টার্গেট ফরম বিক্রি করে অর্থ হাতিয়ে নেয়া। লিখিত ও মৌখিক সাক্ষাতকারে বাতিল করে দেয়া হয় বেশিরভাগ আবেদনকারীকে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় দুয়েকজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন অজুহাতে চাকরিচ্যুত করা হয় নিয়োগকৃতদের। আবারও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে চলে ব্যবসা। এদিকে, বার বার শিক্ষক পরিবর্তনের ফলে পাঠ কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে, অভিভাবকরা।